ভারতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাস্তব চিত্র ও রামপাল নিয়ে শঙ্কা

মওদুদুর রহমান

সুন্দরবনের পিঠে রামপালে ভারতের এনটিপিসির নেতৃত্বে যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করবার আয়োজন চলছে তার বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে প্রবল বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সরকার দাবি করছে এতে সুন্দরবনের কোন ক্ষতি হবে না। এই দাবির অসারতা নিয়ে সর্বজনকথার আগের সংখ্যাগুলোতে বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতে বিশেষত এনটিপিসি পরিচালিত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাস্তব অবস্থা প্রসঙ্গে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।

ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত কয়লানির্ভর। প্রায় দুই লাখ ৭০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন কাঠামোয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে আসে ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ। শিথিল নিয়মকানুন, দুর্বল অবকাঠামো, চরম পরিবেশগত অব্যবস্থাপনা, আর দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের অনুগ্রহে কয়লা পোড়ানো শিল্প ভারতে এক দানবরূপে আবির্ভূত হয়েছে। জল-জমি-জঙ্গল-জীবিকায় মানুষের অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে এই দানবের আগ্রাসনে। ভারতের মতো কয়লার এমন যাচ্ছেতাই ব্যবহার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এ নিয়ে চলছে নানামাত্রিক বিশ্লেষণ, গবেষণা, নিরীক্ষা। অতি সম্প্রতি এমনই এক বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্টে ভারতের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই) ভারতের কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ওপর তাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করে ২০১২ সালে। দুই বছর ধরে চলা তাদের এই গবেষণায় ৪৭টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। বলে রাখা ভালো যে, এ গবেষণায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা পৌঁছানোর পরবর্তী ধাপ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। কয়লা উত্তোলন ক্ষেত্রের পরিবেশ, মাটি-পানি-বায়ু, জীবন ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব এই রিপোর্ট তৈরিতে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। দুই বছর ধরে চলা সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের গবেষণা প্রতিবেদন ভারতে এটাই প্রথম।

ভারতে ২০১২-১৩ সালে ৭০০ মিলিয়ন টন কয়লা ব্যবহৃত হয়েছে, যার ৭০ শতাংশ পোড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। বিপুল পরিমাণ কয়লার এই দানবীয় চাহিদা মেটাতে ভূমি দখল হচ্ছে, কৃষকরা ভিটামাটি হারাচ্ছে, বনের আয়তন কমছে, পানির দূষণ বাড়ছে আর মাটিতে ছড়াচ্ছে বিষ। হিসাবে দেখা যায়, ভারতে ২২% বনভূমি কয়লা উত্তোলনের ফলে বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে অব্যবস্থাপনা আর অনিয়মের শুরু হয় জায়গা নির্বাচন ও স্থানীয় জনসাধারণের জোরপূর্বক উচ্ছেদের মাধ্যমে। জমির ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও কৃষিজমির ক্ষতি এককালীন মূল্য পরিশোধে পূরণ করা অসম্ভব। এতে একদিকে যেমন জীবিকা ধ্বংস হয়, অপরদিকে স্থানীয় মানুষ হঠাৎ করেই জায়গাজমি হারিয়ে ছিন্নমূলে পরিণত হয়। অপরদিকে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখানো হলেও বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজ করার জন্য যে বিশেষায়িত দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তা স্থানীয় কৃষিজীবী সমাজে কারো থাকে না। তাই খুবই নিম্ন বেতনে অস্থায়ী ভিত্তিতে হাতে গোনা কিছু কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে স্থানীয়দের সুযোগ পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এছাড়া সদ্য প্রকাশিত এ রিপোর্টে জমির যথেচ্ছ অপচয় করার অভিযোগের প্রমাণও পাওয়া গেছে।

> সিএসইর গবেষণায় ভারতের কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর স্কোর এসেছে ২৩ শতাংশ, যেখানে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চললে একটি কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্কোর হওয়ার কথা ৮০ শতাংশ। অথচ ভারতের ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্কোরই ২০ শতাংশের নিচে। এনটিপিসির পরিচালিত বাদারপুর প্লান্টের স্কোর ১৬ শতাংশ, যা সর্বনিম্ন।

ভারতের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বছরে ২২ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি ব্যবহার করে, যা সেখানে গৃহস্থালি কাজে প্রয়োজনীয় পানির প্রায় অর্ধেক। এমনকি কুলিং টাওয়ারসমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলো প্রতি মেগাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনে চার ঘনমিটার পানি ব্যবহার করে, যেখানে চীনের কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত হয় ২.৫ ঘনমিটার পানি। অপরদিকে চালু থাকা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৫৫ শতাংশই চরমভাবে বায়ু দূষণ করছে বলে রিপোর্টে জানা যায়। বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির পর পানির অভাবে তা বন্ধ করে দেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই রাইচুর, চন্দ্রপুর, মহাজেনকো কেন্দ্রগুলো পানির অভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য

হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে প্রতিনিয়ত তৈরি হওয়া বিপুল পরিমাণ ফ্লাই অ্যাশ আরেক দুশ্চিন্তার কারণ। ভারতে প্রতিবছর প্রায় ১৭০ মিলিয়ন টন ফ্লাই অ্যাশ তৈরি হয়, যার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। বাকি ছাই উন্মুক্ত অবস্থায় ছাইয়ের পুকুরে জমা করা হয়। এরই মধ্যে এই ছাইয়ের পুকুরগুলো কয়েক বিলিয়ন টন বিষাক্ত ছাই ধারণ করেছে, যা প্রতিনিয়ত মাটি, পানি আর বায়ু দূষণ করে চলছে। এরই মধ্যে ভারতে অন্তত ২০টি কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী নদী এবং জলাধারে ছাইয়ের গাদ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে, যা থেকে বিষাক্ত ভারী ধাতু পানি আর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতে হাতে গোনা কয়েকটি কেন্দ্রে যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা গেছে। বিপরীতে অধিকাংশ কেন্দ্রের ক্ষেত্রেই চুইয়ে কিংবা প্লাবিত হয়ে মাটির নিচের পানি এবং আশপাশের জলাভূমি ও কৃষিজমি দূষিত করছে।

সিএসইর গবেষণায় ভারতের কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর স্কোর এসেছে ২৩ শতাংশ, যেখানে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চললে একটি কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্কোর হওয়ার কথা ৮০ শতাংশ। অথচ ভারতের ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্কোরই ২০ শতাংশের নিচে। এনটিপিসির পরিচালিত বাদারপুর প্লান্টের স্কোর ১৬ শতাংশ, যা সর্বনিম্ন।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম চক্রে এক জায়গা থেকে কয়লা অন্য জায়গায় স্থানান্তরের কাজটিই সবচেয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ। আর বাংলাদেশের জন্য রামপালে নির্মিতব্য দেশের সবচেয়ে বড় কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এই দিকটিই প্রারম্ভিক আশঙ্কার কারণ। কেননা ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এ কেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় ৪৭ লাখ টন কয়লার পুরোটাই আসবে নদীপথে সুন্দরবনের গভীরতম অংশের ভেতর দিয়ে। আর কয়লাবোঝাই জাহাজগুলোর যে কোনো একটির দুর্ঘটনা সুন্দরবনের প্রাণবায়ু নিংড়ে নেবার জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরকারি পরিবেশগত সমীক্ষা (ইআইএ) রিপোর্ট অনুসারে এই কেন্দ্র থেকে বছরে সাত লাখ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও দুই লাখ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে। ক্রমাগত উৎপাদিত এই বিশাল পরিমাণ ছাই কাজে লাগানোর (!) জন্য প্রথমে বলা হয়েছে প্রকল্প এলাকার ১৪১৪ একর জমি ভরাট করার কথা।

এরপর বলা হয়েছে সিমেন্ট কারখানা, ইটভাটায় ব্যবহার করার কথা। এরপর বলা হয়েছে ছাই রফতানির কথা। অথচ বড়পুকুরিয়ায় ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত দৈনিক ৩০০ মেট্রিক টন ছাই মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ করছে। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চার বছরে দুই লাখ ৬০ হাজার টন ছাই পুকুরে জমা করে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। রামপাল প্রকল্পেও ১০০ একরের একটি ছাইয়ের পুকুর তৈরির কথা বলা হয়েছে, পশুর নদী থেকে যার দূরত্ব হবে মাত্র ১২০ মিটার। এই বর্জ্য ছাইয়ের বিষাক্ত ভারী ধাতু বৃষ্টির পানির সাথে মিশে কিংবা চুইয়ে প্রকল্প এলাকার মাটি ও মাটির নিচের পানির স্তর এবং পশুর নদীর সাম্ভাব্য ভয়াবহ দূষণ সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ১৫ হাজার মেগাওয়াটেরও অধিক যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখানে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, এই বিদ্যুৎ উৎপাদন নাকি সাশ্রয়ী। কিন্তু আদতে তা নয়। ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সস্তায় কয়লা পরিবহন পদ্ধতি, অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, পরিবেশগত অব্যবস্থাপনা, পানির যথেচ্ছ ব্যবহার, ত্রুটিপূর্ণ ছাই সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতির কারণে মূলত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন মূল্য কমে আসে। বিপরীতে প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্বীকৃত মানদণ্ডে বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করলে এই বিদ্যুৎ আর সস্তা থাকে না। এছাড়া পরিবেশের ক্ষতি আর দূষণে স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বিবেচনা করলে কয়লাবিদ্যুৎ সাশ্রয়ী তো নয়ই, বরং মোটের ওপর আত্মঘাতী। এতে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জিডিপিমুখী উন্নয়ন হয়তো বাড়ে, কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন স্কেলের কাঁটা কেবলই নিচের দিকে নামতে থাকে।

ভারতের চটকদার উন্নয়ন বিজ্ঞাপনের আড়ালে থাকা বাস্তব চিত্র থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের দোহাই আর নিয়মনীতি মেনে চলার আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে সুন্দরবনের অস্তিত্ব নিয়ে বাজি ধরার কোনো সুযোগ নেই। অথচ স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মতামত, গবেষণালব্ধ ফলাফল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জোরালো দাবি উপেক্ষা করে সুন্দরবনের পাশেই রামপালে ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসির তত্ত্বাবধান আর অংশীদারত্বে গড়ে উঠছে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র। শঙ্কার কথা হচ্ছে, সিএসই (CSE)-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, এনটিপিসির রেটিং সবচেয়ে নিচের দিকে। আর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় নিকৃষ্ট এই কোম্পানির কাছ থেকেই আমাদের শুনতে হচ্ছে ছেলেভোলানো কথা! কথায় আছে, জ্ঞানীরা দেখে শেখে আর বোকারা শেখে ঠেকে। আমরা কি দেখে শিখব, নাকি ঠেকে?

মওদুদ রহমান: প্রকৌশলী
ইমেইল:mowdudur@gmail.com